



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 827 - 836

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় রাঢ়বঙ্গের লোকবিশ্বাস ও লোকক্রিড়া : একটি পর্যালোচনা

কালিদাস পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: kalidaspal95@gmail.com

ID 0009-0005-7255-2669

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

SMRTIKATHA,
RARHBANGA,
LOKABISWAS,
LOKAKRIRA,
DESHBHAG,
YABGRAM,
SMRTIKATHA,
KARIKHELA,
PIR THAKUR.

Abstract

Hasan Azizul Haque spent the morning years of his life in Jabagram, in the Bardhaman district of Rarh Bengal. After passing the Secondary Examination, he moved to Khulna, then part of East Pakistan, to live at his elder sister's house. In the later years of his life, Hasan Azizul Haque wrote a four-volume memoir centered on his birthplace Jabagram and its surrounding regions that he had left behind. Rarh Bengal was as familiar to Hasan Azizul Haque as the palm of his hand. Therefore, in his memoirs, the folk beliefs and folk games of Rarh Bengal have been vividly brought to life through deft and skillful strokes of his pen.

Discussion

যে প্রবন্ধটি লিখতে চেয়েছি, সেটার নাম দিয়েছি 'হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় রাঢ়বঙ্গের লোকবিশ্বাস ও লোকক্রিড়া : একটি পর্যালোচনা'। যেহেতু শিরোনামটি আমাদের স্বনির্বাচিত তাই কৈফিয়ৎ-এর প্রয়োজন দিতে হয় বৈকি। কৈফিয়ৎ-এর প্রয়োজন এই জন্য যাতে করে পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারেন কেন এই শিরোনাম। তাই আমরা শিরোনামের ব্যাখ্যা যাবো বৈকি। তার আগে আমরা জেনে নেব যে রাঢ়বঙ্গের সীমানা কতদূর বিস্তৃত। এই নিয়ে নানা মূনির নানা মত আছে। সেই সব তর্কের দিকে না গিয়ে আমরা একটি সর্বোজনগ্রাহ্য মতামত হিসাবে বলতে পারি যে, 'রাঢ়' অর্থে পশ্চিমবাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলকেই বোঝানো হয়েছে। তার মধ্যে যে সমস্ত অঞ্চল পড়ে সেগুলি হল - বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা (দঃ-উঃ), নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ। তার মধ্যে বর্ধমানকে রাঢ়ের মধ্যমনি বলা হয়। আর এই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত যবগ্রামে (নিগন থেকে এককোশ দূরে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন দুই বাংলার প্রখ্যাত কথাকার হাসান আজিজুল হক। তিনি তাঁর শৈশব ও কৈশর কাটিয়েছিলেন যবগ্রামের মাটিতে। ১৯৫৪ সালে পড়াশোনার জন্য চলে যান দৌলতপুরের খুলনায়। স্থায়ীভাবে ওখানেও থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর একাধিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারি যে এপার বাংলার প্রতি তার নারীর টান ছিল। তাই বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন যবগ্রামের জল-মাটি-বাতাসের সংস্পর্শে। তাই তিনি জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে লিখলেন চার খণ্ডের স্মৃতিকথা মূলক রচনা। ফিরে যাই ফিরে আসি (২০০৯), উঁকি দিয়ে দিগন্ত (২০১১), এই পুরাতন আখরগুলি (২০১৪), দূয়ার হতে দূরে

(২০১৭)। তাঁর জীবনের তিন থেকে প্রায় পনেরো বছর পর্যন্ত স্মৃতিকে অবলম্বন করে আখ্যানের মতো করে চার পর্বের আত্মজীবনীতে তিনি প্রায় নিস্তরঙ্গ শৈশব আর রুখোমাটির রাঢ়বঙ্গের ভূগোলকে ও সজীব ও বাঙালি করে তুলেছেন। আমরা এই ছোট গবেষণায় সেই রাঢ়ের এক গণ্ডম সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যার মধ্যে উঠে এসেছে রাঢ়ের (বিশেষ করে যবগ্রাম বা তার সলগ্ন অঞ্চলগুলিতে) লোকবিশ্বাস, লোকক্রিড়া ও লোকউৎসব। আসলে জন্মসূত্রে আমিও রাঢ়বঙ্গের ভূমিপুত্র। দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। হাসানের মামার বাড়ি মুরাতিপুর যা আমার গ্রাম (নূতনগ্রাম) থেকে চার কিলোমিটার দূরে। আবার হাসান আজিজুল হক যে গ্রামের ভূমিপুত্র তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও আমার পরিচিত আত্মীয়তা সূত্রে। যেমন গীধগ্রাম আমার মায়ের মামার বাড়ি। তাই আশেপাশের গ্রামগুলির সংস্কৃতির সঙ্গে বেশ পরিচিত। আমি এই প্রকল্প পত্রটি করতে গিয়ে মনে হয়ে আমি যেন আমার সংস্কৃতিকেই আয়নার সামনে তুলে ধরছি।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারা এখন বেশ সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল। গদ্যসাহিত্যের ধারায় বিভিন্ন ধরনের সংরূপের ছাপ এখন সুস্পষ্ট। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ যেমন লেখা হয়েছে তার সঙ্গে পালা দিয়ে লেখা হয়েছে স্মৃতিকথা বা আত্মজৈবনিক মূলক লেখা। আমরা ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধকে খুব সচেতন ভাবে পাশে কাটিয়ে স্মৃতিকথা মূলক রচনাতেই আলোকপাত করব। স্মৃতিকথা বলতে মনে রাখা বিষয়কে বুঝায়, যার মধ্যে দিয়ে নিকট অতীতকে স্মরণ করা যায়। কোন কোন ব্যক্তি তার জীবনের ফেলে আসা সময়ের কোন ঘটনার স্মৃতিচারণ বা অতীতকে স্মরণ করে। এই অতীত স্মরণ কেই বলা হয় স্মৃতিকথা। অন্যভাবে বলা যায় স্মৃতিকথা হল একধরনের সাহিত্য, যেখানে লেখক তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বা প্রত্যক্ষ করা বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ স্মৃতি থেকে তুলে ধরেন। যেমন মান্না দে তার স্মৃতির ভান্ডার থেকে লিখেছিলেন ‘জীবনের জলসাগরে’, তাই এই স্মৃতিকথা মূলক রচনা, তার মুম্বাই ও কলকাতার সংগীত জীবন নিয়ে রচিত – এই রকম উদাহরণ আমরা অজস্র তুলে দিতে পারি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’ নারায়ণ সান্যালের ‘আমি নেতাজিকে দেখেছি’, মনিকুন্তলা সেনের- ‘সে দিনের কথা’। সেমন্তী ঘোষের ‘দেশভাগ স্মৃতি স্তব্ধতা’, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দেশভাগ স্মৃতি আর স্বপ্ন’, হাসান আজিজুল হকের চারখণ্ডের ‘স্মৃতিকহন’।

স্মৃতিকথার বৈশিষ্ট্য :

- (ক) স্মৃতিকথা হল ইতিহাসের একটি অন্যতম মৌখিক উপাদান স্থানীয় ইতিহাস লেখায় এটি বিশেষ উপযোগী।
- (খ) স্মৃতিকথা কোন কাল্পনিক কাহিনী নয়, এর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে।
- (গ) স্মৃতিকথায় লেখকের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোচনা থাকে না, থাকে জীবনকালে ঘটে যাওয়া সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনার বিবরণ। যেমন হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘উদ্বাস্তু’ এখানে কেবল পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে।
- (ঘ) লেখক এখানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনার বিশ্লেষণ করে থাকেন।
- (ঙ) লেখক নিজে কাহিনির কখন হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যান তাই রচনার উপস্থাপন হয় উত্তম পুরুষে।
- (চ) স্মৃতিকথায় লেখকের কোন ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশিত হয় যেমন দক্ষিণারঞ্জন বসুর ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ গ্রন্থে দেশভাগের যন্ত্রণার বিশেষ অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক শৈশব ও কৈশরকে কেন্দ্র করে রাঢ়বঙ্গের এক ইতিহাস তুলে এনেছেন।

“তাঁর আত্মস্মৃতি ও আত্মকথন এলোমেলো স্মৃতির গল্প নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কখন ও আত্মস্মৃতির ঘটনা নির্বাচন আলাদা। একজন সচেতন লেখক তাঁর ব্যক্তিক স্মৃতিকে শৈল্পিক অবয়বে নির্মাণ করছেন, অথচ বুঝতে দিচ্ছেন না।”

হাসান আজিজুল হক একজন দক্ষশিল্পী, তিনি তাঁর কলমের জাদুতে আখ্যানের ভিত্তিতে স্মৃতিকথাকে গল্পের আকার উপস্থাপন করেছেন।

রাঢ়বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান : ‘রাঢ়’ খুব প্রাচীন শব্দ। সংস্কৃত অভিধানে এর অর্থ সৌন্দর্য, শোভা, বা শোভাময়ী; কিন্তু বাংলা অভিধানে এর অর্থ বিবিধ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর অর্থ বলেছেন -

- (১) উদ্ধত স্বভাব, রক্ষ প্রকৃতি, গোঁয়ার, নীচতা প্রকাশ, নীচজাতি, ইতর।^২
- (২) গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ পশ্চিমবঙ্গ।^৩

শব্দটি অন্যান্য অনেক প্রাদেশিক ভাষাতেও মেলে, হিন্দিতে - ‘রাঢ়’ মানে নীচ, মারাঠিতে মানে rough, গুজরাটিতে মানে বিবাদ, মৌখিলীতে মানে ইতর জাতীয় লোক, সাঁওতালি ভাষায় ‘রাঢ়ো’ মানে পাথুরে ভূমি, বা পাহাড় বন মালভূমি সমন্বিত বন্ধুর জমি। কোন ভাষায় ‘রৌড়’ মানে শক্ত কাঁকুরে মাটি।^৪

রাঢ় অর্থে একসময় একবিশেষ জনপদ বা ভূখণ্ডকে বুঝাতো। তার নানা প্রমাণ আছে প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালিপিতে : রাঢ় খুব প্রাচীন শব্দ। খ্রিষ্ট জন্মের অন্তত ছ-শো বছর আগেই রাঢ় শব্দটির ব্যবহার ছিল। এর প্রাচীনতম উল্লেখ পাই জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্র ‘আচারঙ্গ সূত্র’। সেই সূত্রেই ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন -

“মহাবীর তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ রাঢ় জনপদে আসিয়াছিলেন (খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) এই জনপথ তখন পথবিহীন আচারবিহীন কোন লোকেরাও নিষ্ঠুর ও রুঢ় প্রকৃতির। তাহারা এই অহিংস যতির পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল।”^৫

ড. রায় আরও জানিয়েছেন, -

“আচারঙ্গসূত্র রাঢ় জনপদের দুইটি বিভাগ বজ্জ বা বজ্জভূমি, সুবভ বা সুস্কভূমি। বজ্জ ভূমিতে জৈন সন্ন্যাসীদের অপরিষ্কৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল।”^৬

তিনি আরোও জানিয়েছেন, -

“নবম দশম শতক হইতেই রাঢ়ে দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ জানা যাইতেছে - উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়-প্রাচীন কালের মোটামুটি বজ্জ বা ব্রহ্মভূমি ও সুস্কভূমি রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথম পাদ) উত্তীরলাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তককণলাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) একই সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে।”^৭

ষোড়শ শতকের ‘দিকবিজয়প্রকাশ’ গ্রন্থেও বলা হয়েছে - রাঢ়ের দক্ষিণ সীমায় দামোদর নদ আছে। বলা হয়েছে- ‘দামদরোত্তর ভাগে রাঢ়দেশ প্রকীর্তিত’।^৮

বাংলা সাহিত্যে রাঢ়-এর উল্লেখ পাই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই। চৈতন্যজীবনী, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মহান্ত জীবনী ও অন্যান্য নানা গ্রন্থে রাঢ় শব্দের ব্যবহার আছে বা ভূখণ্ড অর্থেই।

(ক) বৃন্দাবনদাস, ‘চৈতন্যভাগবত’ (ষোড়শ শতাব্দী) : ধন্য রাঢ় দেশ। রাঢ় মধ্যে একচক্রা।

(খ) শ্যামদাস, ‘মীনকেতন’ (সপ্তদশ শতাব্দী) : গোখরাজ রাঢ়াত চলিল।

(গ) নরহরি চক্রবর্তী, ‘ভক্তিরত্নাকর’ (অষ্টাদশ শতাব্দী) : রাঢ় মধ্যে একচক্রা নামে গ্রাম।

(ঘ) ভারতচন্দ্র, ‘অন্নদামঙ্গল’ (অষ্টাদশ শতাব্দী) শব্দ হৈত রাঢ় বঙ্গে।

(ঙ) মধুসূদন দত্ত (ঊনবিংশ শতাব্দী) : অলীক কুনাট্য রঙ্গে মাজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

আমরা বলতে পারি ‘রাঢ়’ মানে পশ্চিমবাংলার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকেই। তবে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমানা নিয়ে নানা সমস্যা আছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত নন -

(ক) ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বলতে বুঝিয়েছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গকেই।

(খ) ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন - প্রাচীন রাঢ় গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(গ) ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - প্রাচীন রাঢ়ের চতুঃসীমা হল উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগনা।

(ঘ) ড. সুকুমার সেন বলেছেন যে, একদা রাঢ়দেশ বলতে গঙ্গার ওপারের কিছু অংশ এবং এপারের দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা বল্লুকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ‘রাঢ়ী’ উপভাষার প্রচলন ক্ষেত্র বলেছেন মধ্য পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্দেশ করেছেন -

“নিম্ন দামোদর অঞ্চল হইতে ভাগীরথীর পূর্বতীরের অঞ্চল, অর্থাৎ হুগলী হাওড়া, বর্ধমান জেলার সদর মহকুমা (রায়না, জামালপুর), সদর থানা এবং চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা, বারাকপুর মহকুমা এবং পূর্বাংশ বাদে বারাসাত মহকুমা।”^{১৬}

(ঙ) ভাষার নিরিখেই অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ মধ্যপশ্চিমবঙ্গকেই রাঢ়ী উপভাষার প্রচলন ক্ষেত্র বলেছেন তাঁর মতে, -

(১) পশ্চিম রাঢ়ী - বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া।

(২) পূর্ব রাঢ়ী-কলকাতা, চব্বিশ পরগনা (দঃ, উঃ), নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ।^{১৭}

তিনি মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা বলেছেন।

(চ) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুর বা পার্বত্যভূমি এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূ-ভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল।^{১৮}

ঐতিহাসিক পন্ডিত ও গবেষকদের এই সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক কালে অনেকেই মানেন, অনেকেই মানেন না। মিহির চৌধুরী কামিল্যা নিজ উদ্যোগে ১৯৭০ - ১৯৭১ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি যা বুঝেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন ‘রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি’ বইটিতে। সেখানে তিনি বলেছেন -

“রাঢ় হল গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী পশ্চিমবাংলা। তাতে পড়েছে সাম্প্রতিক কালের নিম্নোক্ত জেলাগুলি -

- (১) বর্ধমান।
- (২) বাঁকুড়া।
- (৩) বীরভূম।
- (৪) পুরুলিয়া।
- (৫) পূর্ব মেদিনীপুর।
- (৬) পশ্চিম মেদিনীপুর।
- (৭) হুগলি।
- (৮) হাওড়া।

এবং বৃহত্তর রাঢ় বলতে আমি বুঝেছি এই আট জেলার সঙ্গে সন্নিহিত অন্যান্য জেলার অংশবিশেষ সেখানে এই আট জেলার জীবন ও সংস্কৃতির রূপ বর্তমান।”^{১৯}

আমরা এইসব পণ্ডিতগণের উপর ভরসা রাখছি, রাঢ়বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে। তাই আমরা বলতে পারি দুই বর্ধমানই (পূর্ব-পশ্চিম) রাঢ় বাংলার অন্তর্গত। তাই পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত যবগ্রাম রাঢ়বঙ্গের মধ্যেই পড়ে। এই যবগ্রাম বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে খুব নিবিড় ভাবে যা রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করে।

রাঢ় বাংলার লোকবিশ্বাস ও লোকক্রিড়া - রাঢ়বঙ্গ আমার জন্মভূমি, বাসভূমি, তাই খুব কাছ থেকে রাঢ় বা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। প্রত্যেক স্থানেরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেই সংস্কৃতির বিচিত্র দিক আছে। রাঢ়বঙ্গ বিচিত্র রকমের সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে আমরা রাঢ়বঙ্গে লোকবিশ্বাস ও লোকক্রিড়া সম্পর্কিত পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

(ক) লোকবিশ্বাস : লোকবিশ্বাস একধরনের সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে আমরা প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করতে পারি - গ্রাম সংস্কৃতি, নাগরিক সংস্কৃতি।

গ্রামের মানুষ লেখাপড়া জানেনা, তারা নিরক্ষর, তারা বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া কাজকর্ম, জীবন-যাপন, ধর্ম প্রবণতা, ভাষা-সংস্কার বিশ্বাস যা পায় তাকেই অনেকটা অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করে-তাদের সংস্কৃতিকেই আমরা বলি গ্রাম্য সংস্কৃতি; এই গ্রামীণ মানুষকেই পন্ডিতরা লোক বলেছেন অর্থাৎ যা আর্বান নয় তাই লোক। যা নাগরিক নয় তাই লোক, আর এই গ্রাম সংস্কৃতির বিশ্বাসকে লোকবিশ্বাস বলে। রাঢ়ের লোকবিশ্বাস বিচিত্র রকমের।

- (১) গ্রামীণ দেব দেবী সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস।
- (২) ভূত-প্রেত সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস।
- (৩) ভয় সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস।
- (৪) জন্ম সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস।
- (৫) ধর্ম সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস।
- (৬) ছোঁয়াচ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস।

রাঢ়বঙ্গের লোকজীবন ভরে আছে শুধু নাচ-গান-বাজনা, পুজো-পার্বণ, উৎসব মেলাতেই নয়, খেলাধুলাতেও। খেলাধুলায় শরীর চর্চা হয়, স্বাস্থ্য সুগঠিত হয়, কিন্তু সাধারণ গ্রামীণ জীবনে তা আনন্দের উৎস বলে বিবেচিত হয়েছে, খেলা মানুষকে অনেক কিছু দেয়, বুদ্ধি বাড়ায়, নতুন নতুন জ্ঞানের সঞ্চয় করে, ভাবনা বাড়ে।

খেলাতে দক্ষতা আসে, প্রতিপক্ষকে হারাবার জেদ আসে। জিতলে মনোবল বেড়ে যায়। খেলা কখনোই একার নয়, অন্তত দু-চার জন চাই-ই। কারণ এও একশ্রেণির লড়াই। তাই খেলা মানেই দলবদ্ধ ব্যাপার। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ লাভের এ হলো এক চমৎকার নিদর্শন। রাঢ়বঙ্গে প্রচুর লোকক্রিড়া আছে যেমন বাঘ-চাল, লাউ কাটা-কাটি, ইকিড়-মিকিড়, আগাডুম-বাগডুম, টিক দেওয়া দেয়ি, কড়ি খেলা, লাটু খেলা, মার্বেল খেলা, হাড়ুডু, চু-কিতকিত, কানামাছি, জল ডেঙ্গা ডিং, কাঁপ-ঝপটি ইত্যাদি।

হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় রাঢ়বঙ্গের লোকবিশ্বাস

হাসান আজিজুল হক বাংলা ছোটগল্পের রাজপুত্র। তাঁর জন্মভূমি যবগ্রাম। যবগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত যা রাঢ়বাংলার মধ্যেই পড়ে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে লিখেছেন চার খন্ডের স্মৃতিকথা সেগুলি হল - ‘ফিরে যায় ফিরে আসি’ (২০০৯), ‘উঁকি দিয়ে দিগন্ত’ (২০১১), ‘এই পুরাতন আখরগুলি’ (২০১৪), ‘দুয়ার হতে দূরে’ (২০১৭)। হাসান আজিজুল হক তাঁর জীবনের চার থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতির নানা মালা দিয়ে গেঁথেছেন স্মৃতিকথা, তাই রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন লোকবিশ্বাস তাঁর স্মৃতিকথায় অনাবিল হবে উঠে এসেছে।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সংস্কার যখন মানুষের মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথে যায় তাকেই বিশ্বাস বলে। আর সেই বিশ্বাস যদি লোক সমাজের হয়, তাকেই লোকবিশ্বাস বলে।

(ক) রাঢ়বাংলায় একধরনের লোকবিশ্বাস আছে যদি কোন মানুষ মারা যায় তারপর মরা মানুষের আত্মীয়ের গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম হয় তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে মারা যাওয়া মানুষটা নতুন করে জন্ম নিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে। হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় এই ধরনের উদাহরণ আমরা পাই -

“অবশ্য তাঁর মনে আছে তাঁর নিজের বাবা যখন মারা যান তখন আমি ছয় মাসের পেটে যে কারণে আমার খালারা আমাকে ‘বাপজি’ বলে ডাকতেন, কারণ তাদের বাবাই নাকি ফিরে এসেছে।”^{৩০}

রাঢ়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুর পীর ঠাকুর। এই পীর ঠাকুরকে কেন্দ্র করে নানান বিশ্বাস অবিশ্বাস কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। যেমন কোন বিবাহিত নারীর সন্তান না হলে সন্তান হওয়ার আশায় মানত করে যায়, আমি এই পীর ঠাকুর বা পাঁচু ঠাকুরকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি যে গ্রামে বড় হয়ে উঠেছি আমার মামার বাড়ির গ্রাম (ইছাবট গ্রাম) সেখানে এক পীর ঠাকুর আছে। এই পীর ঠাকুরকে কেন্দ্র করে নানা সংস্কার ও নানা লোকবিশ্বাস জন্মেছে। আমিও এর

প্রভাবের বাইরে যেতে পারিনি। হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় আছে এই পীর ঠাকুরের বর্ণনা। এই পীর ঠাকুরকে কেন্দ্র করে নানান বিশ্বাস হাসান আজিজুল হকের কথকথায় উঠে এসেছে -

“পীর ঠাকুরের কাজ একটাই সন্তানহীন বিবাহিতাদের সন্তানের জন্য বর দেওয়া। তবে হিন্দু নারীরাই কেবল আসতেন, মুসলমান কোনো বধু কোনদিনই নয়। তাদের বিশ্বাস নাই, হিন্দুদের বিশ্বাস আছে। এদের বিশ্বাস কোনদিন এলো না, ওদের বিশ্বাস কোনদিন গেল না। ...এই গরম দেশে পীরের বর কি বৃথা যায়? গিজগিজ করে মানুষ জন্মায় এদেশে। সন্তানরা আসে, বাঁজা, প্রৌঢ়া, আঁটোসাঁটো গড়নের শরতের অপরাহ্নের মতো ভরা যৌবনের নারীরা, একটু বেশি বয়সের বধূরা, সদ্য বিবাহিত মেয়েরা, চাষী সমাজের কঠিন চেহারার কালো কালো রমনীরা। আলতা পরা ধুলো পায়ে খানাখন্দ, কাঁটা-জঙ্গল মাড়িয়ে তারা হেঁটে আসে কড়া-পড়া শক্ত কাজের হাত বাড়িয়ে বেলপাতা চানজল নেয়। ...উদ্ভাসিত মুখে সফল ভক্তরা দ্বিতীয়বার আসতেন সন্তান সঙ্গে নিয়ে। কেউ আসতেন এক বছরের শিশু, কেউ দুই, তিন বা পাঁচ বছরের, যার যেমন মানত থাকত। পীর ঠাকুরকে একবার দেখিয়ে যেত তার দেওয়া মানিক রতন।”^{১৪}

ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়ে বিপদ না ঘটতে পারে তার জন্য অভিভাবকরা বিভিন্ন ধরনের ভয় মিশ্রিত লোকবিশ্বাস এর কাহিনি শুনিয়ে থাকে তেমনি হাসান আজিজুল হকের স্মৃতির স্মৃতিকথায় সেই ভয় মিশ্রিত লোকবিশ্বাসের উল্লেখ আছে -

“কে আর দাঁড়িয়ে থাকে এখানে? একবার কি পুকুরে নামব? পিদিমের মতো দেখতে পুকুর, টলটলে কালো পানি হিম ঠান্ডা-শাপলা আর পানিফলের সবুজ পাতায় ঢাকা তো- ঠান্ডা হবেই টকটকে লাল, গোলাপি আর শাদা তিন রকম শাপলা ফুটে আছে। ঠিক যেন আঁকা, পানিও আঁকা, ফুলও আঁকা, ভীষণ চুপ। ওরা চুপ বলে বাতাস চুপ, নাকি বাতাস চুপ বলে ওরাও চুপ? পুকুরে একবার নেমে গেলে গা জুড়িয়ে যাবে। ফুটন্ত সব কটা শালুক তুলে এনে ডাঁটাগুলো কচ কচ করে চিবুতে পারা যাবে, পানির তলাটাও একবার দেখা যাবে, দু-একটা মাছের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আর নরম মোলায়েম ঠান্ডা পাঁক খানিকটা তুলে এনে গায়ে মাখাও যাবে। তাতে শরীরটা অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা থাকবে। তবে নামতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নামা হয় না পানির তলায় যে একজোড়া শেকলওয়ালা জাঁতা আছে, হঠাৎ তাদের কথা মনে পড়ে যায়। ও দুটো নাকি বেছে বেছে আমার বয়সি ছোটদের বেঁধে পানির তলায় নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে মেরে ফেলে।”^{১৫}

রাড়ের একটি লোকবিশ্বাস হল ভূত প্রেতে বিশ্বাস। আমরাও ছোটবেলায় ভূতের গল্প শুনে আর বাড়ি থেকে বেড় হতে পারতাম না। আসলে মানুষের জীবন-যাপনে মনের সংস্কারের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে থাকে। হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথাতেও এই ধরনের ভৌতিক বিশ্বাস উঠে এসেছে। হাসান আজিজুল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন -

“আমার ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ছিল ঠিকই, তবে তাতে ভয়ের কি আছে-আসে আসুক না সামনে। তাহলেই দেখতে পাই।”^{১৬}

আবার দেখি কালো মারা গেছে যখন হাসান আজিজুল হক তাঁর স্মৃতিকথায় জ্বর বিকার গ্রস্ত শরীরে বালক হাসানের চোখ দিয়ে বলছেন -

“ওই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমার জ্বর এল। এবার কি জ্বর, কেমন জ্বর, কে জানে! ...বেহুশ জ্বর আর ধুম ঘুম। সারারাত শুধু দেখেছি কালো তাদের তেতুল গাছে উঠেছে, সরু লিকলিকে ডালের উপর বসে

আছে, তবুও ডাল একটু নোয়ায় না, ভাঙেও না। সরু সরু হাত বাড়িয়ে ডাকছে। আর যে কালো কথা কইত না কারো সঙ্গে, সেই কালো হি হি করে হাসছে, চামচিকের মতো চিঁ চিঁ করে কথা বলছে।”^{১৭}

হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় রাঢ়বঙ্গের লোকক্রীড়া - হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিকথায় বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া উঠে এসেছে - যেমন লাটু খেলা, মার্বেল খেলা, কড়ি খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, ঝাঁপ ঝাঁপটি ইত্যাদি।

রাঢ়বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা হল লাটু। এই লাটু আমিও খেলেছি বেশ বড় বয়স পর্যন্ত। এক দুই বা তার অধিক জন একসঙ্গে খেলা হয়। একটা গোল দাগ কেটে একজন একটা করে লাটু নিয়ে তাতে লতি বেঁধে গোলের দিকে ছোড়া হয়। গোলের মধ্যে লাটুটা সজোড়ে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে লাটুটা যদি গোলের বাইরে চলে যায় এবং যদি গোলের মধ্যে থাকা অন্য কোনো লাটুকে বার করে আনতে পারে তাহলে লাটুটা তাঁর হয়ে যায় আর যদি বের হতে না পারে তাহলে লাটুটা গোলের মধ্যে রাখতে হয় এই ভাবেই খেলা চলতে থাকে। হাসান আজিজুল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লাটু খেলার প্রসঙ্গে বলেছেন -

“আমার লাটু একমনে ঘুরছে। মরা সৈন্যের মতো সব কটা লাটু কাত হয়ে পড়লে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে এইবার আমারি একটু একটু মাথা কাঁপাতে থাকে, তারপর এক-আধবার শিউরে ওঠে টুক করে শুয়ে পড়ে। আবার চকখড়ি কিংবা ইট দিয়ে দাগিয়ে গোল একটা জায়গা করে তার ভেতরে যখন লাটুদের লড়াই হয়, তখন আমার লাটু অন্যরকম। ঠিক গোলের মাঝখানে পড়ে ঘুরবে, কিছুতেই গোলের বাইরে আসবে না। কাউকে ধাক্কা দেবে না, আর কেউ ধাক্কা দিলে বাইরে ছিটকে পড়বে না। অন্য খেলুড়োদের লাটুগুলো কেউ ফিতেয় জড়িয়ে গিয়ে ঘুরবে না। কেউ গোলের ভিতরে না পড়ে বাইরে পড়বে, কেউ গোলের মধ্যে পড়লেও ঘুরতে ঘুরতে বাইরে এসে পড়বে বা অন্য কারুর ধাক্কায় ছিটকে বাইরে চলে যাবে। আবার কেউ বা আর সব ঠিক আছে কিন্তু ঘোরা শেষ হলে গোলের বাইরে আসতে না পেরে ভেতরেই থেকে যাবে। আমার লাটু তা করে না। ...ওর দোষ যদি কিছু থাকে তা একটাই, ও কাউকে আক্রমণ করে না, কারও গায়ে পড়ে না, ধাক্কাও দেয় না। তবু সব সময় ও-ই জেতে। লোকে বলে পয়মন্ত লাটু। আমি বলি, আমার ছোট ভাই, বুঝমন্ত, জ্যামন্ত, তাই কথা বুঝতে পারে, কথা শুনে চলে।”^{১৮}

রাঢ়ের অন্য আরেকটি খেলা হল কড়ি খেলা। এই খেলাটা খুবই জনপ্রিয়। এটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে খেলা হয়ে থাকে -

(ক) দানদান।

(খ) চালাচালি।

(গ) গাবগাব।

তবে দানদান বা চালাচালি খেলাটাই অধিক দেখা যায়। দুইজন বা তার অধিক একসঙ্গে খেলা হয়। ধরা যাক দানদান খেলায় একজন একটা আঁটা নিয়ে চাললো, অপরজন দান ধরে। যে এই আঁটাটা ঠেকাতে পারল বা পারবে বা চার আঙুলের মধ্যে দাঁড় করাতে পারবে তাকে যতদান কড়ি ধরবে তাকে দিতে হবে। আর না ঠেকাতে বা চার আঙুলের মধ্যে দাঁড় করাতে না পারলে অপরজনকে যতদান কড়ি ধরবে সব কড়ি দিতে হবে। আর চালাচালি খেলতে দুহাতে পাঁচটা করে কড়ি নিয়ে চালতে হয় পাঁচটা কড়ি যদি চিৎ হয়ে পড়ে তাহলে সব কড়ি তার আর যদি না পড়ে তাহলে অপরজন চাল দেয় সেটা অন্য কড়ি দিয়ে ঠেকাতে হয় এইভাবেই কড়ি খেলা হয়। হাসান আজিজুল হক-এর স্মৃতিকথায় কড়ি খেলার প্রসঙ্গে বলেছেন -

“আমরা কড়ি খেলি হয় ‘চালাচালি’, নাই ‘দান দান’। ‘চালাচালি’ খেলা তত ভালো লাগে না। মেঝেতে মুখ গুঁজে বসে পালাপালি চলে যাও। হয়তো একটা দুটো কড়ি জুটল, কোনো কোনোবার একটাও না। একঘণ্টা খেলার পর হয়তো সব হারলে, নাই দুচারটে কড়ি জিতলে। তার চেয়ে ‘দানদান’ খেলা

অনেক ভালো। বড় বড় দান সাজানো আছে, দূর থেকে আটা যদি দানের ওপর কিংবা চার আঙুল ফাঁকের মধ্যে ফেলাতে পারলে, তাহলে গোটা দানই তোমার। এই খেলায় হয় ফতুর নয় রাজা। দু'রকম খেলাতেই আমার দুই আটা বন্ধ। সিসের আঁটাটা দূর থেকে ছোঁড়ার আগে চোখ বন্ধ করে বলতাম 'দান দান,' দুই আঙুলে আঁটাটাকে একটু আদর করে বলতাম, দান আনিস, যা-বলেই ছুঁড়ে দিতাম। তারপরেই দেখি, আরে, দান একেবারে ছত্রখান, সব কড়ি চারদিকে ছিটকে পড়েছে। কখনো বা দেখি আমার সিসের আঁটা একটু দূরে পড়ে সামান্য এগিয়ে দানের কাছে গিয়ে থামল। চোঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে 'দান দান' বলে কাছে গিয়ে দেখি হ্যাঁ, ঠিক চার আঙুলের মধ্যেই আঁটা পড়েছে। তার মানে পুরো দান আমার।"^{১৯}

উপসংহার : দুই বাংলার বিখ্যাত কথাকার হাসান আজিজুল হক। তিনি একাধারে ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ যেমন লিখেছেন তেমনি জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে লিখেছেন স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা (চার খন্ডে) সেগুলি হল - 'ফিরে যাই ফিরে আসি' (২০০৯), 'উঁকি দিয়ে দিগন্ত' (২০১১) 'এই পুরাতন আখরগুলি' (২০১৪) 'দুয়ার হতে দূরে' (২০১৭) আসলে তিনি পড়াশোনার জন্য এপার বাংলা ছাড়লেও তাঁর মননে-যাপনে এপার বাংলা রয়ে গেছে তাঁর লেখা ছোটগল্প, উপন্যাস, বা স্মৃতিকথাগুলি পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায়। তাঁর লেখা চার পর্বের স্মৃতিকথাতে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পনেরোটা বছর স্মৃতিকথার ক্যানভাসে তুলে এনেছেন। তাঁর লেখা যেন রাঢ়বঙ্গের ইতিবৃত্ত। আর হাসান আজিজুল হক-এর গ্রাম ছিল বর্ধমানের যবগ্রাম, এই বর্ধমান রাঢ়বঙ্গের মধ্যমণি, ফলে হাসান আজিজুল হক-এর স্মৃতিকথায় রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান উঠে এসেছে। লোকবিশ্বাস ও লোককিড়া রাঢ়বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান যা, হাসান আজিজুল হক তাঁর স্মৃতিকথায় তুলে এনেছেন স্মৃতির স্মৃতিমেদুরতা থেকে।

Reference:

১. হক, হাসান আজিজুল : ২০১৯, স্মৃতিকথন, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা - প্রকাশকের কথা
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ : প্রথম প্রকাশ-১৩৪০-১৩৫৩, বঙ্গীয় শব্দকোষ, (দ্বিতীয় খণ্ড প-হ), সাহিত্য অকাদেমী, নিউদিল্লী, পৃষ্ঠা - ১৯১২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯১২
৪. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী : রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃষ্ঠা - ৪১
৫. রায়, নীহাররঞ্জন : প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা - ১১৬-১১৭
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৭
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৮
৯. সেন, সুকুমার : চতুর্দশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৪৮
১০. শ্ব, রামেশ্বর : তৃতীয় সংস্করণ ৮ ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫৬২
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, বাংলা মঙ্গলকাবেব ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫০২
১২. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী : রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃষ্ঠা - ৪৬
১৩. হক, হাসান আজিজুল : প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, স্মৃতিকথন, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৫
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ২০-২১
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০-৩১

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪
১৮. হক, হাসান আজিজুল : প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, স্মৃতিকহন, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৫
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮

Bibliography:

ক. আকর গ্রন্থ :

হক, হাসান আজিজুল, স্মৃতিকহন, বাংলাবাজার, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

খ. সহায়ক গ্রন্থ :

আনোয়ার, চন্দন, হাসান আজিজুল হক আলাপন ও মূল্যায়ণ, ঢাকা : কবি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২২

কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ আগস্ট, ২০০৬

কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

চক্রবর্তী, অলোক, আখ্যানের তত্ত্বভূবন, কলকাতা : আশাদীপ, নভেম্বর ২০২১

চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রনাথ ও থান্ডার, বিমল কুমার, কলকাতা : রাঢ় ভাবনা (প্রথম খণ্ড), ১২ জানুয়ারি ২০১৯

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নদীয়া : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ডিসেম্বর ২০০৮

দাস, অমিতাভ, আখ্যান তত্ত্ব, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০

দত্ত, সম্রাট, বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

দেববর্মা, দেবল, রাঢ় বাংলার ইতিবৃত্ত, কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৮

দে, সত্যব্রত, রাঢ় সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৯০

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, (দ্বিতীয় খণ্ড প-হ), নিউদিল্লী : সাহিত্য অকাদেমী, প্রথম প্রকাশ-১৩৪০-১৩৫৩

বিশী, প্রমথনাথ, পুরানো সেই দিনের কথা, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৭

ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ন্যারোটলজি : ছোটগল্প : ছোটদের গল্প, কলকাতা : কোরক, ২০১৪

মিত্র, অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর, কলকাতা : ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৯৭২

মুখোপাধ্যায়, অনিমা, সতেরো শতকের রাঢ়-বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা : অনিমা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯০

রায়, ভব, রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি, মডার্ন কলাম, জানুয়ারি, ২০১৩

লাহিড়ী, রণবীর, আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান, কলকাতা : চর্চাপদ, ২০১১

শ, রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

সেন, সুকুমার, ভাষায় ইতিবৃত্ত, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্দশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

গ. পত্রিকাপঞ্জি :

আনোয়ার, চন্দন (সম্পাদক), গল্পকথা, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, ৩য় সংখ্যা, রাজশাহী : ফেব্রুয়ারি ২০১০

মোল্লা, ইউসুফ (সম্পাদক), বর্ণিক, হাসান আজিজুল হক স্মরণ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা, ২০২২
লাহিড়ী, সৌমিত্র, একুশ শতক, হাসান আজিজুল হক, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা : ফেব্রুয়ারি ২০২২

ঘ. আর্কাইভ ও বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি :

হাসান আজিজুল হকের ‘স্মৃতিকহন’, উপস্থাপনায় মলয় রক্ষিত। লিঙ্ক-

<https://youtu.be/02PpMmURkgE> অনুসন্ধান- ১৮/০১/২০২৩